International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 44-51
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

‘বাসনার বক্ষমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধার্ত যৌবন’-এর গল্প

ড. অভিজিৎ চৌধুরী

Abstract

A multi-dimensional detailed account of the appetite of thirsty heart and the longing of the bodily existence has been made in the pages of Bengali fiction and one of the best illustrators in that genre is Jyotirindra Nandi. We see that Jyotirindra Nandi walked a slightly different path between contemporary time and life. In his story-novel, he portrays the depravity of values, including the life of a man standing in the midst of a contemporary turbulent difficult situation, a life of lust-anger-violence, unprincipledness. In his creative literature, he has tried to portray the behavior of the middle class people in front of his eyes, the way he saw the ongoing life flow driven by hunger-sleep-sex-anger-cum-violence in his fictional story. There are very few writers like him who have been able to dive so deep into the abysmal darkness of the deep mind of the character. He specifically wanted to show that the individual's activity is not limited to the fulfillment of money-food-clothing or dignified needs, but also the satisfaction-dissatisfaction driven by the lust-anger-violence hidden in the darkness of his mind. In his story, this biological desire has given birth to a mental disorder somewhere and has become a natural beauty by merging with the beauty of vain nature.

Keywords: Thirsty heart, sex, Jyotirindra Nandi, Middle class mentality and society

ক্ষুধার্ত যৌবনের আকুতি বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’তে স্পষ্ট উচ্চারিত হয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথ অতিক্রম করেছে। সেই যাত্রাপথে কবিতার শরীরের সীমায়িত শব্দমালাকে অতিক্রম করে যৌবনের অপার পিপাসার বহুমাত্রিক বিস্তৃত ভাষ্য নির্মিত হয়েছে বাংলা কথাসাহিত্যের পাতায় এবং সেই ধারাতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। আমরা দেখি, সমকালীন সময়-পরিসর ও জীবনের মাঝে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী পদচারণা করেছিলেন খানিকটা ভিন্ন পথে। সমকালীন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কঠিন পরিস্থিতির মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের, কাম-ক্রোধ-হিংসাময় বিপর্যস্ত জীবন, নীতিহীনতা, সহ মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই তিনি তাঁর গল্প-উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। সময়ের বাধ্যবাধকতার কারণেই কোনপ্রকার আদর্শবাদ, সাধ্যাতীত স্বপ্ন, আলোর পথে উত্তরণের প্রয়াস গল্পকার তাঁর সুবিস্তৃত গল্প বা উপন্যাসে সেভাবে তুলে ধরেনি। কারণ সেই অভিজ্ঞতাও তাঁর জীবন থেকেই পাওয়া। সেই অভিজ্ঞতালব্ধ ক্ষুধার্ত যৌবনের ক্রন্দনকে বৃহত্তর আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টাতেই তিনি কলম ধরেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী নিজেই জানিয়েছেন যে— *“আমি স্বীকার করছি। আলো দেখাবার জন্য, উত্তরণ দেখাবার জন্য আমি এ বই লিখিনি। ...কেননা আমি যে সব চরিত্র দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অন্বেষণ, খাওয়া ঘুম মৈথুন সন্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোন দিনই তারা কিছু করে না।”*[১]

চোখের সামনে থাকা মধ্যবিত্ত মানুষগুলির আচার-আচরণ, ক্ষুধা-ঘুম-মৈথুন-ক্রোধ-কাম-হিংসা তাড়িত চলমান জীবন প্রবাহকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন, তাকেই কল্পনাশ্রিত কাহিনিতে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাঁর সৃষ্ট-সাহিত্যে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনিও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছিলেন চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে। পাশাপাশি

তাঁর গল্পে জৈবিক প্রবৃত্তিতাড়িত চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে হ্যাভলক এলিসের দেহবাদী যৌনতার ধারণাকেও অনুভব করা যায়। তাঁর মতো খুব কম লেখকই আছেন যিনি চরিত্রের গহন মনের অতল অন্ধকারের এতটা গভীরে ডুব দিতে পেরেছেন। তিনি বিশেষভাবে দেখাতে চেয়েছেন ব্যক্তি মানুষের ক্রিয়াশীলতা শুধু অর্থ-অন্ন-বস্ত্র বা মর্যাদাগত চাহিদা পূরণের মধ্যে সীমায়িত থাকে না, সেই সঙ্গে তার মনের অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কাম-ক্রোধ-হিংসার প্রবৃত্তিতাড়িত তৃপ্তি-অতৃপ্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্প সাহিত্যে উঠে আসা মানুষগুলি সম্পর্কে অজন্তা সাহা বলেছেন— *"সেই মানুষটি হয়তো মধ্যবিত্ত বা নিম্ন-মধ্যবিত্ত, সেই মানুষটি হয়তো বেকার কিংবা বেকার হবার মুখে; তারই ক্ষুধা তৃষ্ণা কাম হিংসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে যৌনতার মতো ইন্দ্রিয় সংবেদনকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার উপর স্থান দিয়ে ফেলেন বারবার। 'গোটা মানুষটা' আর তখন সামনে এসে দাঁড়ায় না, দাঁড়ায় এক কামার্ত বা বিকৃতকাম আধা-মানুষের প্রতিছায়া।"*[২]

মধ্যবিত্ত মানসের জটিলতাকে সাহিত্যে উপস্থাপন নতুনত্ব কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু তাকে ভিন্ন লিখনভঙ্গি দিয়ে সাজিয়ে তাতে নতুনত্ব প্রদান করেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সাহিত্যের দরবারে তাঁর স্বতন্ত্রস্থান অধিকার করে নিয়েছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষগুলোর জৈবিক চেতনা কীভাবে তাদের মনস্তত্ত্বের জটিলতার জন্ম দিয়েছে, তারই সার্থক রূপ তুলে এনেছেন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর বিভিন্ন গল্পে। এমনই এক জটিল মনস্তত্ত্বের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে 'শালিক কি চড়ুই' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত নাম গল্প **'শালিক কি চড়ুই'** গল্পে। গল্পে দেখি মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র, পেশায় কেরানি তারাপদবাবু বিবাহ করেন উচ্চবিত্ত পরিবারের কন্যা শান্তনু ওরফে শানুকে। বিত্তশালী পরিবারে বিবাহ করার হেতু তারাপদবাবুকে তাঁর মধ্যবিত্ত সমাজের বন্ধুদের কাছে সমালোচনার শিকার হতে হয়। নানাভাবে তারা তারাপদবাবুকে তাঁর দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করে। তারাপদবাবু একসময় অতিষ্ট হয়ে ওঠেন। গল্পকারের কথায়— *'পৃথিবীতে এত বন্ধু আছে জানা ছিল না তারাপদ'র। ধারণাটাই তার ছিল না যে বিয়ের পর, বেছে বেছে বন্ধুদের সঙ্গেই দেখা হবে আর তারা এতসব কথা বলবে। বলতে গেলে একরকম গায়ে পড়ে। যেচে আর সব বউ সংক্রান্ত।'*[৩]

মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা থেকে তারাপদবাবুর বন্ধুরা উত্তেজিত ও কৌতূহলী হয়ে ওঠে। একদিকে তারা তারাপদবাবুর সমালোচনা করে। অপরদিকে ভাবে তারাপদবাবু কীভাবে এমন পরিবারের মেয়েকে বশীভূত করেছেন। তারা বিভিন্নভাবে তারাপদবাবুকে ক্ষেপানোর চেষ্টা করে বলে *'রং বদলায় ওরা শুনেছি, রক্ত বদলায় না। পদ্মপুকুর রোডের মেয়ের মেজাজ বুঝতে আরও কদিন সময় নেবে তোমার, ভায়া।'*[৪] কিন্তু বন্ধুদের কোনো টিকা-টিপ্পনীই তারাপদবাবুর ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উপরন্তু তিনি স্ত্রীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। বিবাহের মাত্র দুমাসের মধ্যে স্ত্রীর সৌন্দর্য তাঁর কাছে নতুন রূপে ধরা দেয়। তাঁর মনে হয় *'দুমাসের পরিচয়েও কত অপরিচিত থেকে যায় মেয়েরা, কেমন নতুন অচেনা থেকে তাদের শরীর এক-একসময়, টুথব্রাশ ও জিভছোলা কামড়ে ধরা ঝকঝকে দাঁতের মতো চকচক করছে ওর চোখজোড়া, পাখির গায়ের মতো কালো সদ্যধোয়া চোখ, জল লেগে আছে পলকে। ভিজে আঁচল কোমরে জড়ানো, টসটস করে জল ঝরছে নিটোল নিতম্ব, গোলাপি আভার সুন্দর উরু আর জঙ্ঘা বেয়ে। ঠিক স্নানের পর শান্তনুকে সে আর কোনওদিন দেখেনি।'*[৫] স্ত্রীর রূপ ও গুণে মুগ্ধ তারাপদবাবু বন্ধুদের কথার তেমন আমল না দিয়ে নিজের মনে স্ত্রীর রূপের সৌন্দর্যবৃক্ষ নির্মাণ করেন। উনিশ বছর বয়স্কা স্ত্রীর সৌন্দর্য যেন নিত্যই নতুন নতুন রূপে তার কাছে ধরা দেয়। তাই বন্ধুদের মধ্যবিত্ত মানসিকতাজাত কদর্য মন্তব্যও স্ত্রীর সৌন্দর্য ও গুণের ছটায় ফিকে হয়ে যায়। তাই তারাপদর চিৎকার করে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে করে *'একটি স্বামী-স্ত্রীর জীবন বাইরে থেকে তোমরা কী দিয়ে বিচার করবে, কতটুকু ?'*[৬]

গল্পের ঘটনাক্রমে দেখি স্ত্রীর রূপে ও গুণে বিভোর তারাপদবাবু একদিন যখন নির্দিষ্ট সময়ে অফিস ছুটির পূর্বেই বুকে একরাশ উত্তেজনা আর ভালোবাসা নিয়ে স্ত্রীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য বাড়ি ফিরে আসেন তখন তাঁর অন্দরমহল থেকে এক পরপুরুষকে বের হতে দেখে তিনি হতবম্ব হয়ে যান। তাঁর নিজের ঘরে নিজেকেই যেন অচেনা কোন তৃতীয় পুরুষ বলে মনে হয়। তার ওপর স্ত্রীর অসহায়ের মতো হতাশভাবে এলোচুলে দাঁড়িয়ে থাকা তারাপদর কাছে পরপুরুষের উপস্থিতির হেতু জানার অপেক্ষা রাখে না। তথাপি হতাশ মন নিয়ে তারাপদবাবু স্ত্রীকে এই পরপুরুষটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁর আধুনিকা স্ত্রী ছেলেটি সম্পর্কে সবকথাই অকপটে স্বীকার করে। শান্তনু জানায় *'আমি যখন দুপুরবেলা বাগানে গিয়ে বসে থাকতুম ও রোজ গিয়ে দাঁড়িয়েছে চুপ করে পিছনে, এই পল্লব সেন। কিন্তু ওদের বলে আমি আজও বোঝাতে পারলুম না আমি একলা-স্বভাবের, অন্যরকম।'*[৭]

স্ত্রীর বিবাহ পূর্ববর্তী কুমারীকালীন কথাগুলো তারাপদবাবুর মানসিক যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুললেও তিনি কিন্তু মনকে স্থির রেখে একাগ্রচিত্তে সে সমস্ত কথাগুলো শ্রবণ করেছিলেন। শান্তনু যে ভিন্ন স্বভাবের। সে যে শালিখকে ধরতে চায় না, সে চায় প্রকৃত মনুষ্যত্বের চড়ুইকে— একথা সে যেমন অন্য পুরুষদের বোঝাতে চায় তেমনভাবে স্বামীর কাছেও প্রকাশ করে এবং সেই সঙ্গে তার স্বামী যে অন্য স্বভাবের সেকথাও সে স্বামীকে জানায়। স্ত্রীর এই অকপট স্বীকারোক্তি মধ্যবিত্ত মানসিকতার তারাপদবাবুর মনের সমস্ত রঙিন স্বপ্নকে যেন এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দেয়। স্ত্রীর প্রতি পরপুরুষের জৈবিক চাহিদামূলক ইঙ্গিতের কথায় তাঁর মন তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত হলেও তারাপদবাবু কিন্তু শান্তভাবে নিজের মনকে সান্ত্বনা দেন। তাঁর বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাঁর মন বলে ওঠে *'অন্য মেয়েদের মতো স্বামীর ঘর ছেড়ে শান্তনু পদ্মপুকুর রোডে ফিরে গেছে কি। সোনার পদ্মপুকুর রোড ধরে রেখেছে এই মেয়ে এখানেই, এই ঘরে, —তারাপদর ছোট স্যাঁতস্যাঁতে বারান্দায়।'* [৮] এ যেন তারাপদর নিজেকেই নিজের সান্ত্বনা দেওয়া। হতাশা আর অসহায়তায় তাঁর মন যেন তাঁর প্রতিই ব্যঙ্গের হাসি ছুঁড়ে দেয়। স্ত্রীর প্রতি পরপুরুষের জৈবিক চাহিদা, তাঁর স্ত্রীর উদাসভাবে বহির্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত— এসমস্ত কিছুই তারাপদবাবুর মানসিক অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাঁর নিজেকে অসহায় মনে হয়। তিনি ভাবেন *'কে জানে কাল আবার কী আসে, শালিক না চড়ুই।'* [৯] ভগ্ন মন নিয়ে তারাপদবাবু পদ্মপুকুর রোডে তাঁর অর্ধাঙ্গিনীর অসহায়তায় এক ধরণের অসহ্য সুখে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন।

গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষগুলোর জটিল মনস্তত্ত্বকে সচেতনভাবে আলোচ্য গল্পে তুলে ধরেছেন। এখানে একদিকে যেমন তারাপদবাবুর বন্ধুদের মধ্যবিত্তসুলভ কুরুচিকর মন্তব্যের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের কদর্য মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে গল্পকার তারাপদবাবুর মধ্যদিয়ে এক উদার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তারাপদবাবু নিজের স্ত্রীর কাছে পরপুরুষের জৈবিক চাহিদা দেখেও তার তীব্র প্রতিবাদে মুখর না হয়ে বরং শান্তভাবে নিজের অস্থির মনকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়েছেন। যদিও তিনি স্ত্রীর রূপ-গুণের সাগরে ডুবে বাস্তব কঠিন পরিস্থিতিতে হতবাক হয়ে গিয়েছেন, তবু কোন এক অসহ্য আনন্দে সুখ খুঁজে নিয়েছেন। মধ্যবিত্তের মনোজগতের এই জটিল রহস্যকে খুব সুন্দরভাবে আলোচ্য গল্পে গল্পকার উপস্থাপন করেছেন। মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ তারাপদবাবু আত্মদংশনে বিদ্ধ হয়েছেন তথাপি কোথাও কোনো প্রকাশ্য প্রতিবাদে সামিল হননি। এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার ভিন্নতর জটিলরূপকে গল্পকার টেনে এনেছেন এই গল্পের অবয়বে। আর এখানেই গল্পকারের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **'বন্ধুপত্নী'** গল্পটির মধ্যে মধ্যবিত্ত মনোজটিলতা ও জৈবিক প্রবৃত্তির আর এক চিত্র পাই। গল্পে দেখি সুধাংশু ও সুবিনয় দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুধাংশু মার্চেন্ট অফিসে চাকুরিরত এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিভূ। তার স্ত্রীও চাকুরিরতা। স্ত্রীর সঙ্গে তার দাম্পত্য সুখের অভাব লক্ষিত হয়। সুধাংশুর স্ত্রী স্বেচ্ছাচারী এবং কিছুটা স্বাধীনচেতা হওয়ায় সে তার নিজস্ব ভাবনার বাইরে এসে স্বামীর সাথে বাইরে হাসতে নারাজ। সর্বদা নিজের চিন্তায় মগ্না রেবা স্বামীর কষ্টকে উপেক্ষা করে নিজের কাকুর সংসার দেখার অভিপ্রায়ে স্বামীর থেকে দূরে থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে সুধাংশুর দাম্পত্য জীবনের এই চিড় আরও বড়ো হয়ে দেখা দেয় যখন সুধাংশু তার বন্ধু সুবিনয়ের স্ত্রী ও সংসারকে খুব কাছ থাকে লক্ষ করে।

স্ত্রী রেবার সুধাংশুর প্রতি ভালোবাসাহীনতা সুধাংশুর মনে এক গভীর অতৃপ্তি তৈরি করেছিল। তাদের এই দাম্পত্য সংকটের কথা সুধাংশু তার বন্ধু সুবিনয়কে খুলে বললে সুবিনয় বন্ধু সুধাংশুর কথা ও কিছুটা নিজের অভাবের সংসারের স্বার্থের কথা ভেবে বন্ধুকে নিজের বাড়িতে ভাড়া থাকার পরামর্শ দেয়। সুধাংশু প্রথমটাই আপত্তি জানালেও পরে সম্মতি জানায়। সুবিনয়ের সংসারে একসাথে তাদের সাথে ওঠা-বসা করায় সুধাংশু তাদের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি সমস্তটাই অবলোকন করার সুযোগ পায় এবং সুধাংশুর মনে নানারকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। বন্ধু সুবিনয়ের স্ত্রীর সৌন্দর্য আর বুদ্ধিদীপ্তি দেখে নিজের স্ত্রীকে সবদিক দিয়েই খুব ছোট বলে মনে হয়েছিল সুধাংশুর। নিজের দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্ত থেকে সুধাংশুর বন্ধুর ও বন্ধুপত্নীর দাম্পত্যসুখ দেখে কিছুটা স্বস্তি পেতে হতেছিল। তাই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সুধাংশু তার অস্থির মনের পিপাসায় বন্ধু সুবিনয়ের দাম্পত্য সম্পর্কে উঁকি মারা অন্যায় জেনেও নিজেকে আটকে রাখতে পারেনি। আর তাই সুধাংশু বলে *"রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি সুবিনয় স্ত্রীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অরুণা না জানি কেমন করে কথা বলবে শুনতে ছেলেমানুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান খাড়া রেখেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রখর বৃষ্টির শব্দ আর এই ছোট্ট বাসায় পাশের কামরায় সুবিনয়ের সংসারের সুমন্ত ছোট-বড় মানুষগুলোর লম্বা লম্বা শ্বাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না। কান খাড়া রেখে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা করে আমি অতঃপর ওদের দুজনের, বন্ধু সুবিনয় ও তার স্ত্রী অরুণার শ্বাস-প্রশ্বাস বিচার করতে লাগলুম।"* [১০] দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তিই সুধাংশু মনের জৈবিক চেতনাগুলোকে বেশি করে নাড়া

দিয়েছিল। একদিন এক বর্ষামুখর দিনে সুধাংশু যখন ঘুম না আসায় বিছানায় শুয়ে জীবনের অতৃপ্তির কথা ভেবে ছটফট করছিল, ঠিক তখন তার ঘরে হঠাৎ সুবিনয়ের স্ত্রী অরুণা প্রবেশ করে। অরুণাকে দেখে সুধাংশুর কাছে অরুণার রূপ যেন আরও বেশি করে ধরা দিল। সুধাংশুর বর্ণনায় *"আপনাদের বলেছি এমন বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভামন্ডিত মোহিনী মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি নাক কপাল ভুরু ঠোঁটের পিছনে সরু সাদা দাঁতের সারি চোয়ালের ধার লম্বা পালকঘেরা বিদ্যুৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, হ্যাঁ, রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল। আমি সময়ের অতিরিক্ত সময় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিস্পন্দন হয়ে রইলাম।"* [১১] এক যৌনচেতনা সুধাংশুর মনকে অস্থির করে তুলেছিল। অরুণাকে এক ভয়ঙ্কর নতুন লাগছিল সুধাংশুর। স্বামী সোহাগিনী অরুণার উপস্থিতি তাকে মাতাল করে দিয়েছিল। এক শ্বাসরূদ্ধকর পরিস্থিতির জন্ম হয়েছিল সুধাংশুর মনে। সেই বর্ষণমুখর রাত্রিতে সুধাংশুর দাম্পত্যের পিপাসা আরও বেশি করে জাগ্রত হয়ে তার ভেতরকার আদিম প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। তাই সুধাংশুর কথায় *"...আমি হিংস্র উন্মত্ত পশুর মতো ওর অনাবৃত সাদা বাহুটা স্বজোরে চেপে ধরলাম যেন প্রতিশোধ নেবার আর কোনও উপায় ছিল না বলে আমাকে তা করতে হয়েছিল। আমার হৃৎপিণ্ডের দুবদুব আওয়াজটাই কানে আসছিল শুধু। আর কোন শব্দ ছিল না।"* [১২] কিন্তু পরক্ষণেই আবার সুধাংশুর বক্তব্যে পাই— "সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রমুষ্টির মধ্যে ওর নরম তুলতুলে হাতটা ধরে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার নূন্যতম চেষ্টা না করে ধীরে ঠান্ডা গলায় বলল *'এ মাসে ওর চিকিৎসা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে, ছি ছি কী ছিরি হয়েছে পোষাকের, এই নিয়ে তো ও আপিস-কাছারি করছে !' আমার বজ্রমুষ্টি শিথিল হয়ে হাতটা নীচে গড়িয়ে পড়ল।"* [১৩] —অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মানসের সুধাংশু তার দাম্পত্য জীবনের অসুখী হওয়ায় নিজের যৌনক্ষুধা থেকে বন্ধুপত্নী অরুণার কাছে অগ্রসর হলেও স্বামী সন্তান প্রিয় অরুণার ঠান্ডাভাব তাকে খুব বেশি অগ্রসর হতে দেয়নি। সুধাংশু মানসিকভাবে চঞ্চল হয়ে উঠলেও আবার মনকে এই অন্যায়কাজ করা থেকে বিরত করে। মধ্যবিত্ত মনোজগতের এই জটিল রূপগুলোকে গল্পে প্রত্যক্ষ করিয়ে গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী তাঁর অসীম দক্ষতার পরিচয় প্রদর্শন করেন। মধ্যবিত্ত মনে লুকিয়ে থাকা এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলো তাঁর লেখনীর দক্ষতায় ভাষ্য হয়ে ওঠে।

'গিরগিটি' গল্পের মধ্যে মধ্যবিত্ত মননের যৌনচেতনা, প্রকৃতির সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা অদ্ভুতভাবে মিশ্রিত হয়ে আছে, যার থেকে পাঠক এক অন্যধরণের স্বাদ অনুভব করে। প্রণব ও মায়ার মধ্যবিত্ত সংসারে একুশ বছরের মায়ার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা খুব বেশি করে পরিলক্ষিত হয় আলোচ্য গল্পে। গল্পে দেখি প্রণবের স্ত্রী মায়া উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজের দৈহিক সৌন্দর্যকে মেলে ধরে। গল্পের শুরুর দিকে মায়ার শারীরিক বর্ণনায় জৈবিকচেতনার আভাস স্পষ্ট— *'...ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ থুতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘষবে। খসখসে গালের ঘষায় মায়ার থুতনির ছাল উঠে যায় যেন।'* [১৪]

তবে রূপ ও সৌন্দর্যে ভরপুর মায়া শুধু স্বামীর কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করতে করতে ক্লান্ত। তাই সে উন্মুক্ত প্রকৃতির কাছে নিজের সৌন্দর্যকে মুক্ত করতে তাদের ভাড়া বাড়ির কুয়োতলায় এসে স্নান করার সময় নিজেকে নগ্ন করে ফেলে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের কাছে নিজের আবৃত শরীরকে এক এক করে অনাবৃত করে কোন এক অপার সৌন্দর্যতৃষ্ণায় মনকে পাগল করে তোলে। লেখকের বর্ণনায় দেখি *'এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়ার ঝপটায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপটে যেতে হাত ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি ! গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনই দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শিরশিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা বুক পেট কোমর তলপেট ঊরু হাঁটু হাটুর নীচে পায়ের মাংসল ডিম দুটোকে সতেজ স্নিগ্ধ করে দেয়।'* [১৫] শুধু প্রকৃতির কাছেই নয় মায়া তাদের ভাড়াবাড়ির আর এক প্রতিবেশী হাড় জিরেজিরে বৃদ্ধ ভুবন সরকারকেও তার দৈহিক সৌন্দর্যের আবেশে মাতাল করে তোলে।

দিন-রাত্রী স্বামীর কামুক চোখে নিজের শারীরিক প্রশংসায় মায়ার মনে সন্তুষ্টি এনে দিতে পারে না। তার যৌন ক্ষুধা মিটলেও মানসিক অতৃপ্তি থেকেই যায়। প্রণব তার স্ত্রীকে আরও রূপ লাবণ্যে ভরিয়ে তোলার জন্য তার মন পাবার আশায় অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে ফজ্‌লি আম, পাউডার ইত্যাদি নিয়ে আসে। কিন্তু স্বামীর অতিরিক্ত আদিখ্যেতায় মায়ার

এইসমস্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। স্বামীর সোহাগে কোনো সৌন্দর্যপ্রীতি না থাকায় মায়া হাঁফিয়ে ওঠে। উপরন্তু স্বামীর মধ্যবিত্ত মানসিকতায় সে অসন্তুষ্ট হয়। স্বামী যখন তাকে তাদের পাশের পাড়ার কোন এক ভদ্রলোক তাদের ঝিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা খুব রসিয়ে বলে সমালোচনামুখর হয়ে স্ত্রীর কাছে সোহাগ পাবার আশা করে, তাতে মায়া ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে স্বামীর প্রতি তার ক্রোধ বর্ষণ করে এবং এইসমস্ত যে তার কাছে অভদ্রতার নামান্তর সেকথা সে স্বামীকে জানিয়ে দেয়। স্বামীর অশোভন মানসিকতা ও সৌন্দর্যহীনতা মায়াকে দুঃখিত করে তোলে। যে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে মায়া মুগ্ধ হয়ে যায়, সেই সৌন্দর্যতৃষ্ণা মায়া স্বামীর সাথে ভাগ করে নিতে পারে না। কারণ তার মনে হয় তার স্বামীর *'সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ ? সেই কান নেই।'*[১৬] স্বামীর উপস্থিতিও মায়ার কাছে তাই বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে বৃদ্ধ ভুবন সরকার, যাকে দেখে মায়ার মরা গাছ বা ছাতাপড়া পুরনো ইঁটের পাঁজার কথা মনে হয়।

কিন্তু স্বামীর কাছে নিজেকে মেলে ধরার চাইতে এই বৃদ্ধর কাছে নিজেকে উজার করে দিতে মায়া বেশি মানসিক শান্তি অনুভব করে। অপরদিকে দেখি ভুবন সরকার তিনবার বিবাহ করার পরও এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের যৌন পিপাসা মেটাতে চতুর্থবার নাছোড়বান্দা শশীর মেয়েকে বিবাহে রাজি হয়ে যায়। কিন্তু মায়া যখন তাকে বলে, এ বয়সে আর সাহস করবেন না, *'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।'*[১৭] তখন তার প্রত্যুত্তরস্বরূপ রসিক বৃদ্ধ ভুবন সরকার বলেন *'তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি।'*[১৮] তিনি আরও আবেগাপ্লুত হয়ে বলে ওঠেন *'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'*[১৯] অর্থাৎ এই দুর্বল বৃদ্ধর কাছে এই পিপাসা যে শুধু যৌন পিপাসা তা নয় তা সৌন্দর্য পিপাসারই নামান্তর। তাই সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বলেছেন— *"জ্যোতিরিন্দ্র তথাকথিত বাস্তববাদী লেখক নন। তার চেয়ে কিছু বেশি, আসলে তিনি অন্তর্লোক-উন্মোচনকারী শিল্পী, সৌন্দর্যবাদী। সৌন্দর্যের সামগ্রিকতা ও ব্যক্তিনিরপেক্ষতায় তাঁর আগ্রহ আছে। জ্যোতিরিন্দ্রর এই বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক 'গিরগিটি' গল্পটি। এ গল্পের বুড়োটা ভাড়াটে বাড়ির বৌদির স্নানের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ।... এই মুগ্ধতার অন্তরালে যৌনবাসনা ক্রিয়াশীল নয়, সৌন্দর্য দৃষ্টি ক্রিয়াশীল। আর ঐ যুবতি বৌটিও দেখে কুয়োতলার নির্জনতা, শ্যাওলা, রোদ, কচুগাছ, জলের ধারা, একটা প্রজাপতি, একটা গিরগিটি। সবটা মিলিয়ে একটা পরিপূর্ণ ছবি।"*[২০]

তাই স্বামীর সৌন্দর্যবিহীন যৌনতৃষ্ণায় ক্লান্ত মায়া এই বৃদ্ধ সৌন্দর্যপিয়াসী ভুবন সরকারের কাছে মাঝরাতে জংলা ছিটের সায়া পড়ে নিজের সৌন্দর্যতৃষ্ণা মেটাতে ছুটে যায়। মায়া নিজেকে প্রায় উন্মুক্ত করে এইভাবে শায়া পড়ে ভুবন সরকারের কাছে গিয়ে নিজের সৌন্দর্যের মাত্রা ভুবন সরকারের কাছে জানতে চাইলে বৃদ্ধ তাঁর শৈল্পিক চোখ দিয়ে বলে *'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নরাচড়া করেছে। চিতাবাঘিনি, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘষা কোমর দিদির।'*[২১] —এই বর্ণনায় মায়া যেন নিজেকে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই মায়া নিজেকে আয়নায় দেখতে চাইলে ভুবন সরকার দুঃখিত হয়ে বলেন *'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখে কি দিদির বিশ্বাস হয় না ?'*[২২] তিনি আরও বলেন *'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে, কিন্তু ভেতরে রসের বাল্‌ব জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মতো ঝকঝকে করে রেখেছি, ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনও বুঝতে বাকি।'*[২৩] বৃদ্ধ ভুবনবাবুর এককথায় আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে তাঁর শরীর গেলেও রূপরসের তৃষ্ণা কিন্তু আজও অটুট রয়েছে। তাঁর সৌন্দর্যপ্রীতি কিংবা রূপের শৈল্পিক ব্যাখ্যায় মায়া যেন কোন এক আত্মতুষ্টি অনুভব করে, যা তার স্বামীর নিরস যৌনাকাঙ্খায় অধরা থেকে যায়। আর তাই মায়া স্বামীর ঘর ছেড়ে সেই তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির আশায় নিজেকে বৃদ্ধ ভুবন সরকারের কাছে সমর্পণ করে। নিজের উষ্ণ কোমল হাত সে হাড় জিরজিরে মরা শুকনো কাঠের শরীরযুক্ত ভুবন সরকারের গায়ে অবলীলায় তুলে দেয়।

প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য আর বৃদ্ধ ভুবন সরকারের অসীম সৌন্দর্যরসের পিপাসার কাছে মায়া নিজেকে সমর্পণ করে কোন এক অজানা আনন্দে নিজের মনকে ভরিয়ে তোলে, মনের শান্তি অনুভব করে। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র মায়ার এই বিচিত্র মনস্তত্ত্বকে গল্পকার তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অসাধারণ রূপ দিয়েছেন। শুধু শুকনো জৈবিকতা নয় প্রকৃতির উদার রূপ রসের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে সেখান থেকে রূপতৃষ্ণা মেটানোর এক অদ্ভুত মনস্তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন গল্পকার তাঁর অসীম দক্ষতায়।

এইরকমই **'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা'** গল্পটির মধ্যেও এক অসাধারণ জৈবিকচেতনা-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বের স্বরূপকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। রেবা আর তার কলেজে চাকুরিরত বিদ্বান স্বামীর ছোট্ট মধ্যবিত্ত সংসারে তৃতীয় এক নারী কুন্দর আনাগোনা দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল রেবার কাছে। রেবাদের পাশের ফ্ল্যাটের জলধরবাবুর মেজো মেয়ে

কুন্দ। কুন্দ রূপসী, বিবাহিতা কিন্তু তাঁর স্বামী মাতাল ও অমানুষ হওয়ায় স্বামীর সংসার সে ত্যাগ করেছে। দাম্পত্য জীবনের যে সুখ যৌনতৃষ্ণা কুন্দকে ধীরে ধীরে বিকারগ্রস্ত করে তুলেছিল। কুন্দর প্রগলভতা এবং অন্যের দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি জিজ্ঞেস করার কৌতূহলই তার এই বিকারগ্রস্ততার লক্ষণ। রেবার সুখের দাম্পত্য সম্পর্কে কুন্দ মনে মনে ঈর্ষান্বিত হয়। রেবা ও তার স্বামীর গতিবিধি, কুন্দ সর্বদা লক্ষ করে। নানারকম অশালীন কথার দ্বারা রেবার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কুন্দ তার অতৃপ্ত মনের আকাঙ্খা থেকে যখন রেবাকে বলে *'হ্যাঁ ভাই, এমন সুন্দর করে খোঁপা বেঁধেছে। রাত্রে খোঁপা ঠিক থাকে ?'*[২৪] কিংবা যখন নির্লজ্জভাবে বলে *'...কলে জল না আসতে উনুনে আগুন— হি হি হি —তাই বলছিলাম, মনে কি আর অন্যকিছু আছে, সিনেমা তো ছেলে ভুলনো ছড়া, এসময় সিনেমা সার্কাস কেউ দেখে ? এখন কোনরকমে এদিকের কাজ মিটিয়ে ঘরের আলো নেভানো, তারপর বিছানায় ঢোকা, হি হি হি।'*[২৫] —এসমস্ত কথা রেবার অসহ্যতার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। তার ইচ্ছে হয় সে কুন্দকে কিছু কড়া কথা শোনায়, কিন্তু সে পারে না। অবশেষে কুন্দর অশালীনতার মাত্রা আর সহ্য করতে না পেরে রেবা তাকে বলে বসে *'তুমি আর আমার ঘরে আসো না ভাই, আমি পায়ে ধরে বলছি। আমি তোমার মতন মেয়ে নই, আমার রুচি অন্যরকম।'*[২৬] কিন্তু কুন্দর বিকারগ্রস্ততা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলে। সে রেবার সঙ্গে এই ধরণের কথা বলে মানসিক শান্তিলাভ করে। নিজের দুঃখকে কিছুটা হলেও ভুলে থাকার চেষ্টা করে। সমাজব্যবস্থার চাপে একটি নারীর মনের দুর্বার আকাঙ্খাকে দমিয়ে রাখার যে জটিল মনস্তত্ত্ব তা গল্পকার অসাধারণ নিপুণতার সঙ্গে অঙ্কণ করেছেন আলোচ্য গল্পে।

রেবা, কুন্দর আচরণে অতিষ্ট হয়ে যখন তার অধ্যাপক স্বামীকে সব কথা খুলে বলে তখন তার স্বামী হাস্যমুখে কুন্দর মানসিক অবস্থা বোঝানোর চেষ্টা করে বলেন *'এই হয়। ওর অবদমিত কামনা আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ এগুলো। তোমার আমার গোপন কথা টেনে এনে নিজের অতৃপ্ত ইচ্ছাকে রসিয়ে রাখতে চাইছে ও।'*[২৭] —আসলে কুন্দর অতৃপ্ত যৌন বাসনাই যে তাকে এরূপ অসামাজিক বিকৃত রুচিসম্পন্ন করে তুলেছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তীতে কুন্দর বিকৃত রুচি সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, ঘটনায় দেখা যায় কুন্দ ভোরবেলা রেবার বিছানার দিকে জানলা দিয়ে উঁকি মারে। রেবা হঠাৎ দেখে ফেললে সে পালাতে গিয়ে পায়ে কাঁচ ফুটে যায়। কিন্তু এমন কুরুচিকর ঘটনার পরও কিন্তু কুন্দ থেমে থাকেনি। সে অকপটে রেবার কাছে স্বীকার করে *'যেমন চুরি করে দেখতে এসেছিলাম শাস্তিও পেয়েছি,— এতবড় একটা ভাঙা কাঁচের টুকরো বিঁধে কি অবস্থা হয়েছে দেখ—'*[২৮] কুন্দর মানসিক যন্ত্রণা দেখে তাকে সমস্ত শালীনতা-অশালীনতার উর্দ্ধে পৌঁছে দিয়েছে। যেখানে তার লজ্জাবোধের জায়গা নেই। কিন্তু এরূপ অন্যায় সত্ত্বেও কুন্দ যখন রেবাকে বলে *'আমি না হয় চুরি করে দেখতে এসে অপরাধ করেছিলাম ভাই, তোমারও মস্ত ভুল হয়েছে, ঘুম ভেঙে বিছানা ছেড়ে ওঠার সময় স্বামী-দেবতার পা ছুঁয়ে মাটিতে পা দিতে হয়, বৌ, তা কি তোমার জানা নেই !'*[২৯]—কুন্দর এরূপ উক্তি রেবার মধ্যে কোথায় যেন তার প্রতি স্নেহবোধ তৈরি করে, যা থেকে রেবা কুন্দকে 'বোন' সম্বোধন করে বসতে বলে। তার পায়ের যন্ত্রণার কথা জিজ্ঞেস করে। রেবার প্রশ্নে কুন্দ তার মনের আসল পরিস্থিতির কথা স্বীকার করে বলে *'পায়ের কাটা-ঘা কদিন থাকে, ঘা শুকোয় না মনের।'*[৩০]

কুন্দর মানসিক যন্ত্রণা বলে বোঝবার নয়, তা অনুভবযোগ্য। তার দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্তি তাকে নির্লজ্জ রমণীতে পরিণত করেছে। সে নিজের অন্যায় বুঝতে পেরেও তার অবাধ জৈবিকচাহিদাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। রেবার দাম্পত্য জীবনের দিকে উঁকি মেরেই সে তার মনের অতৃপ্ত আত্মাকে শান্ত করতে চায়। মধ্যবিত্ত নারীর এই ট্র্যাজিক মনস্তত্ত্ব জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

'নীল পেয়ালা' গল্পটিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে যৌনতা ও মনস্তত্ত্ব একই সঙ্গে কাজ করেছে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর মধ্যে। গল্পটিতে দেখি বৈদ্যনাথবাবু, যিনি এ.জি অফিসে কাজ করেন এবং একইসঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ। তিনি তিপান্ন বছরে পৌঁছে শারীরিক যৌবনতার সক্ষমতা হারালেও মনের যৌবনতাকে ধরে রেখেছেন। আর তা বাস্তব হয়েছে এক কিশোরের সঙ্গে আলাপের পর। তিনি একজন সতেরো বছরের কিশোরের মতো চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। সারা প্রকৃতি তাঁর কাছে রঙীন হয়ে উঠেছে। বৈদ্যনাথবাবুর এই অবস্থার বর্ণনায় গল্পকার বলেছেন— *'...তাঁর মনে হয়েছিল তিনি ছোট হয়ে গেছেন, কিশোর হয়ে গেছেন, শুকনো খসখসে দাড়ির গালে হাত বুলোতে বুলোতে তাঁর মনে হয়েছিল ইচ্ছা করলে মানুষ তার বয়স কমিয়ে দিতে পারে। ইচ্ছা করলে বৈদ্যনাথ ওভারকোট জুতো দস্তানা ছেড়ে খালের জলে সাঁতার কাটতে পারেন,*

ইচ্ছা করলে তিনি তেলের পিপে বোঝাই লড়িটার পেছনে ছুটতে পারেন। শরীরটা কিছু না; মন, মনের দিক থেকে আশ্চর্য এক অরণ্যের উত্তাপ অনুভব করতে করতে বৈদ্যনাথ কেমন যেন অস্থির ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।'[৩১]

অপরদিকে দেখি যে কিশোরকে দেখে, যার সান্নিধ্যে এসে বৈদ্যনাথবাবুর মানসিক অবস্থার পরিবর্তন, সেই কিশোরটির মধ্যে এর বিপরীত মনোভাবনার জন্ম হয়। এক অদ্ভূত বার্ধক্য এই অল্পবয়সী কিশোরটিকে আচ্ছন্ন করে তোলে। মনের এক গভীরে দুশ্চিন্তা এই প্রাণচঞ্চল ছেলেটির চঞ্চলতাকে কেড়ে নেয়। বৈদ্যনাথবাবু ছেলেটির কাছে তার মনের অবস্থার কারণ জানতে চেয়ে তাকে নানাভাবে আনন্দ দিয়ে তার মন বদলানোর প্রয়াস করেন, কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা বিফলে যায় যখন কিশোরটি তার তীব্র মানসিক যন্ত্রণা থেকে বলে ওঠে *'হয়তো আজই আমি মরব, আজ বা কাল, একটা চলন্ত লরি-টরির সামনে ছুটে গিয়ে পড়ে যাব, —তা হলেই আমায় চাপা দিয়ে শেষ করে দেবে।'*[৩২] জীবনের কোনো না পাওয়ার বেদনা থেকে হয়তো বা প্রকৃতির উদাসীন ছবি দেখে কিশোরটির মনে এরূপ আত্মহত্যার কল্পনা আসতে পারে ভেবে বৈদ্যনাথবাবু তার মনকে একটু ভিন্ন স্বাদ দিতে পার্কে নিয়ে যান। কিশোরটিকে পার্কের রঙীন ফ্রক পরা মেয়েগুলোর দিকে তাকাতে বলে তার মনে যৌনস্বাদ আনার চেষ্টা করেন এবং সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ বৈদ্যনাথবাবু নিজের মনের যৌনতাকে প্রকাশ করতেও লজ্জাবোধ করেন না। তিনি গলায় একধরণের বিশ্রী শব্দ করে বলেন *'ওই যে সবুজ ফ্রক পরা ফর্সা মেয়েটি লম্বা বেণী দুলিয়ে স্কিপিং-এর দড়ি ঘোরাচ্ছে, আমি ঠিক তার কাছে ছুটে যেতাম, ভাব করতাম।'*[৩৩]

বৈদ্যনাথবাবু যেন কৈশোরকালে পৌঁছে গিয়ে নির্দ্বিধায় নিজের মনের জৈবিক চাহিদাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। তাঁর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়ে— তিনি ভাবেন, *"আ, কী চলা। মেয়েটার কী সুন্দর গায়ের রং, পা দুটো কেমন লম্বা, হাত দুটোকে মনে হচ্ছে দুটো সোনার বর্শা।"*[৩৪] অচেনা মেয়েটি সম্পর্কে বৈদ্যনাথবাবুর এই দৈহিক বর্ণনা লাগামছাড়া যৌন আকাঙ্ক্ষারই নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাঁর এসমস্ত কথায় কিশোরটি না ভুলে আরও গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এইসমস্ত অশোভন কথা তার মানসিক যন্ত্রণাকে আরও উস্কে দেয়। তাই যে বৈদ্যনাথবাবুকে কিশোরটির কয়দিন আগেও ভালো লেগেছিল, তখন তাঁর উপস্থিতি তার কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য গল্পটিতে গল্পকার একদিকে যেমন প্রৌঢ় বয়সী বৈদ্যনাথবাবুর মধ্যবিত্ত-মনের যৌনতা, তাঁর জৈবিক চেতনাকে দেখিয়েছেন, অপরদিকে তেমনি কিশোরটির মনের জটিল মনস্তত্ত্বকেও অসীম নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর **'পতঙ্গ' 'খুকি' 'ট্যাক্সিওয়ালা', 'কালো বউদি', 'অজগর', 'নিয়মের বাইরে'** ইত্যাদি গল্পেও দেখি এক ভিন্ন ধরণের স্থূল যৌনতার বিকারকে। এছাড়াও তার লেখা বহু গল্পে যৌনতার অনুষঙ্গ এসে মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোর মনগহনে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারময় প্রবৃত্তির তাড়নাকে উদ্ঘাটিত করেছে। এভাবেই মধ্যবিত্ত মানুষের জৈবিক-চেতনামূলক বিকৃতিগুলোও জীবন্তরূপে ধরা দিয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে। তাঁর গল্পে এই জৈবিকচাহিদা কোথাও কোথাও মানসিক বিকারের জন্ম দিয়েছে কোথাওবা অসার প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক নৈসর্গিক সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। আসলে যৌনতা মানুষের জীবনেরই পরিপূরক একটি দিক। মানুষের রূপ-সৌন্দর্যের সঙ্গে কিংবা তার দাম্পত্য জীবনে এই যৌনতা পরিপূর্ণতা এনে দেয়। অর্থাৎ শুধু ভালোবাসা নয়, সেখানে নারী-পুরুষের ভালোবাসার মধ্যে দৈহিক জৈবিকচেতনা জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে। তাই বাসনার বক্ষমাঝে ক্ষুধার্ত যৌবনের কান্না, বহমান পরিপূর্ণ জীবনেরই অংশ হিসেবেই জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখনীতে ধরা দেয়।

তথ্যসূত্র:

১) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'আমার সাহিত্য জীবন', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প,* সম্পাদনা- সুব্রত রাহা ও অজয় দাশগুপ্ত, কলকাতা- ৭৩, বিবেক ভারতী, প্রথম প্রকাশ- কলকাতা পুস্তক মেলা' ৯৩, পৃ. ৩০৩।
২) সাহা অজন্তা, *'কথাশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী',* কলকাতা- ১২, মুদ্রাকর, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৪৯।
৩) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র- ১,* কলকাতা- ০৯, আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ- নভেম্বর ২০১৬, ISBN- 978-93-50400-470-6, পৃ. ৫৯।
৪) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩।
৫) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪।
৬) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, '*শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২।

৭) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৪।
৮) তদেব।
৯) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'শালিক কি চড়ুই', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত,, পৃ. ৭৫।
১০) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'বন্ধুপত্নী', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৪।
১১) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'বন্ধুপত্নী', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৫।
১২) নন্দী
১৩) তদেব।
১৪) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'গিরগিটি', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২০।
১৫) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'গিরগিটি', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩।
১৬) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'গিরগিটি', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৮।
১৭) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'গিরগিটি', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪।
১৮) তদেব।
১৯) তদেব।
২০) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, *'কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ'দশ বছর: ১৮৯১-২০০০',* কলকাতা- ৭৩, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ- বৈশাখ ১৪১১, ISBN 81-7612-763-2, পৃ. ৩৭৪।
২১) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'গিরগিটি', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৫।
২২) তদেব।
২৩) তদেব।
২৪) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প,* সম্পাদনা- নিতাই বসু, কলকাতা-৭৩, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশঃ কলকাতা পুস্তক মেলা- জানুয়ারি ২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ- ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৪৪।
২৫) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬।
২৬) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭।
২৭) তদেব।
২৮) তদেব।
২৯) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'পাশের ফ্ল্যাটের মেয়েটা', জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮।
৩০) তদেব।
৩১) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'নীল পেয়ালা', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩২।
৩২) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'নীল পেয়ালা', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৫।
৩৩) নন্দী জ্যোতিরিন্দ্র, *'নীল পেয়ালা', গল্পসমগ্র ১,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৮।
৩৪) তদেব।